যুগান্তর

তারিখ 31 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে অভিন্ন নীতিমালা প্রসঙ্গ

দেশপ্রেমের চশমা

মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার

বাংলাদেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ বিষয়ে পেশাদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। বর্ণের ছদ্মাবরণে প্রচলিত দলীয় রাজনীতির প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে প্রায়ই নিরপেক্ষতা ও মেধা উপেক্ষিত হয়। এ কারণে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মান ক্রমান্বয়ে নিচে নামছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আর শিক্ষকের মান নিচে নামলে তো গ্র্যাজুয়েটদের মানও নিচে নামবে। কারণ, উন্নতমানের মেধাবী ও গবেষক শিক্ষক না থাকলে ভালো গ্র্যাজুয়েট তৈরি হবে কীভাবে? এ কারণে আন্তর্জাতিক চাকরির বাজারে বাংলাদেশী সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটরা অন্যান্য দেশের গ্র্যাজুয়েটদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছে না। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা বাড়লেও সে তুলনায় তাদের মান বাড়েনি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ দিতে পারি। বছর বিশেক আগেও শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা অনেক কম থাকলেও অনুষদে অনুষদে অনেক খ্যাতিমান শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকতা ও গবেষণায় তাদের অবদান ছিল অনন্য। কিন্তু এখন বেতন ও সুযোগ-সুবিধা বাড়লেও ওই রকম শিক্ষক ও গবেষক তৈরি হচ্ছেন না।

আশির দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক পদে যোগদান করে আমি একটি শিক্ষক কক্ষে ১৬ থেকে ১৭ শিক্ষকের সঙ্গে বসতাম। লেখাপড়া ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণও কম ছিল। কিন্তু তখন এবং পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক খ্যাতিমান শিক্ষক ছিলেন। তারা একাডেমিক পারফরম্যান্সের জন্য নিজ ডিসিপ্লিনে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত ছিলেন। বিজ্ঞানী অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ অধ্যাপক আবদুল করিম, বাংলা সাহিত্যের গবেষক ড. আনিসুজ্জামানের মতো শিক্ষক ছিলেন। ওই সময়ের তুলনায় এখন শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বেড়েছে। একজন অধ্যাপক একা এক রুমে বসছেন। ইন্টারনেট, কম্পিউটার ও প্রিন্টিং সুবিধাসহ আরও অনেক সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। কিন্তু আগের তুলনায় শিক্ষকদের মান বাড়েনি। এখন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজ ডিসিপ্লিনে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত শিক্ষকের সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে কমে আসছে। নতুন শিক্ষকদের মধ্য থেকে এখন জামাল নজরুল ইসলাম, আবদুল করিম, আনিসুজ্জামান, সৈয়দ আলী আহসান বা আবু হেনা মোস্তফা কামালদের মতো শিক্ষক তৈরি হচ্ছে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য তৈরি মানের সূচকে বাংলাদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উপরে উঠে আসতে পারছে না।

আজ থেকে ২০-২৫ বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষ-মনোযোগী ছিলেন। তারা শিক্ষার্থীদের সময় দিতেন। কিন্তু এখন সম্মানিত অনেক শিক্ষকই শ্রেণীকক্ষে বা শিক্ষার্থীদের বেশি সময় দিতে পারছেন না। এখন তাদের ব্যস্ততা বেড়েছে। এ ব্যস্ততা একাডেমিক কাজ বা গবেষণার ব্যস্ততা নয়; এ ব্যস্ততা অর্থ-বিত্ত উপার্জনের ব্যস্ততা। উল্লেখ্য, এখন ভিসি-প্রোভিসি হওয়ার জন্য শিক্ষকরা দলীয় রাজনীতি করেন। অর্থ উপার্জনের জন্য কনসালটেন্সি করেন। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। সান্ধ্যকালীন কোর্সে পাঠদান করেন। ফলে এসব কাজে সময় দেয়ায় শিক্ষক তার মৌলিক সৃষ্টিশীল গবেষণায় অবদান রাখার জায়গাটিতে দুর্বল হয়ে পড়েন। একাডেমিক চর্চার চেয়ে অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাজনীতির চর্চা বেশি গুরুত্ব পায়। এর ফলে সার্বিকভাবে শিক্ষক ও শিক্ষকতার মান নিচে নামছে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা ও পেশাদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে না পারায়। এ কারণে মেধাবীরা শিক্ষকতায় অগ্রাধিকার পাননি। রাজনীতি ও লেনদেনের প্রভাবে কম যোগ্যরা শিক্ষকতায় আসছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ত্রুটি থাকায় এমন নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে। মনে রাখা ভালো, ক্লাস সেভেন-এইটে পড়ানোর জন্য স্কুলশিক্ষক হতে চাইলে নিবন্ধন পরীক্ষা, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেতে হয়। একাদশ বা দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ানোর জন্য কলেজশিক্ষক হতে গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিবন্ধন পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা, প্রেজেন্টেশন ও মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেতে হয়। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, অনার্স-মাস্টার্স বিষয়ে পড়ানোর জন্য সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের শিক্ষক হওয়ার প্রক্রিয়া কত সহজ! কেবল একটিমাত্র নামকাওয়াস্তের মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাওয়া যায়। শুধু মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে সঠিকভাবে প্রার্থীদের মেধা যাচাই করা যায় কিনা সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। এ মৌখিক পরীক্ষাও নেয়া হয় খুব অল্প সময় নিয়ে। এমন অভিযোগ আছে, কারা চাকরি পাবেন সে বিষয়টি পর্দার অন্তরালে দলীয় বিবেচনায় আগেই নির্ধারিত হয়ে যায়। পরে মৌখিক পরীক্ষাকে ব্যবহার করা হয় আইওয়াশ হিসেবে। এ কারণে দেখা যায়, মৌখিক পরীক্ষায় খুব ভালো করেও অনেক প্রার্থীর চাকরি হয় না। আবার ওই পরীক্ষায় খুবই খারাপ করেও অনেকের চাকরি হয়। উল্লেখ্য, মৌখিক পরীক্ষার কোনো রেকর্ড রাখা হয় না বলে এ পরীক্ষায় পক্ষপাতিত্ব ও দুর্নীতি করা সহজ। এভাবে তুলনামূলকভাবে অযোগ্য প্রার্থীরা শিক্ষক হতে পারলেও খ্যাতিমানরা শিক্ষক হতে পারেন না।

নবনিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা খ্যাতিমান শিক্ষক হবেন কীভাবে? বিসিএসসহ সরকারি বা বেসরকারি চাকরিলাভের পর নতুন কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণ নিয়ে তারপর কাজে যান। কিন্তু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রভাষকরা কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়া সরাসরি শ্রেণীকক্ষে গিয়ে ক্লাস নেন। এটা ধরে নেয়া কি যুক্তিসঙ্গত যে, যাকেই প্রভাষক নিয়োগ দেয়া হোক না কেন, তিনি শ্রেণীকক্ষে ভালো পড়াতে পারবেন? শিক্ষকতার কাজটি কি এতই সহজ? যে কেউ চাইলেই ভালো পড়াতে পারবেন? এ ধারণা একেবারেই ভুল। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রতুল। সম্প্রতি অবশ্য অপরিকল্পিতভাবে কিছু প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন— চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্টার ফর এক্সেলেন্স, সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্স ইন্সটিটিউট এবং ইউজিসির হেকেপ প্রজেক্টের আওতায় নবীন শিক্ষকরা সীমিত সংখ্যায় প্রশিক্ষণের সুযোগলাভ করেন। তবে এসব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম স্বল্পমেয়াদি ও অপরিকল্পিত হওয়ায় এ থেকে শিক্ষকরা ভালো ফল পান না। এসব প্রশিক্ষণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কীভাবে গবেষণা প্রবন্ধ লিখতে হয়, কীভাবে গবেষণা প্রস্তাবনা তৈরি করতে হয়, কীভাবে গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হয়, কীভাবে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে হয় ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা দেয়া হয়। কিন্তু একজন নতুন শিক্ষকের মূল দায়িত্ব পালনের জায়গাটিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। যেমন— কীভাবে ক্লাস নিতে হয়, কীভাবে প্রশ্ন করতে হয়, কীভাবে খাতা দেখতে হয়, কীভাবে পরীক্ষার খাতায় নম্বর দিতে হয়— এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না। ফলে শিক্ষকরা তাদের কাজে যোগ্য ও পেশাদার হতে পারেন না। এসব বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রণয়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ইউজিসির গাফিলতি রয়েছে।

> ক্লাস সেভেন-এইটে পড়ানোর জন্য স্কুলশিক্ষক হতে চাইলে নিবন্ধন পরীক্ষা, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেতে হয়। একাদশ বা দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ানোর জন্য কলেজশিক্ষক হতে গেলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিবন্ধন পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা, প্রেজেন্টেশন ও মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেতে হয়। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, অনার্স-মাস্টার্স বিষয়ে পড়ানোর জন্য সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের শিক্ষক হওয়ার প্রক্রিয়া কত সহজ! কেবল একটিমাত্র নামকাওয়াস্তের মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পাওয়া যায়। শুধু মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে সঠিকভাবে প্রার্থীদের মেধা যাচাই করা যায় কিনা সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। এ মৌখিক পরীক্ষাও নেয়া হয় খুব অল্প সময় নিয়ে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক নিয়োগকেন্দ্রিক অনিয়ম-নৈরাজ্যিক অবস্থায় পৌঁছার পর এ বছর ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এ ক্ষেত্রে শৃংখলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অনুধাবন করে গবেষণা শুরু করেছে। এ অবস্থায় সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ইউজিসি এ ক্ষেত্রে শৃংখলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের নিয়োগ ও পদোন্নতির অভিন্ন নীতিমালার খসড়া তৈরি করেছে। এ নীতিমালায় বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়োগ ও পদোন্নতির অনুষদভিত্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। অভিন্ন যোগ্যতার মাপকাঠিতে শিক্ষক নিয়োগ করা হলে মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব হবে এবং বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে সমরূপতা প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকরা এ খসড়া নীতিমালা পর্যালোচনা করে মতামত দেয়ার পর এটি চূড়ান্ত করার কথা বলা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, খসড়া নীতিমালায় শিক্ষক নিয়োগে লিখিত পরীক্ষা ও প্রেজেন্টেশনের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি। প্রভাষক পদে প্রয়োজনে লিখিত পরীক্ষা নিয়ে নিয়োগ দিতে ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রস্তাব করেছে। প্রার্থীর ক্লাস প্রেজেন্টেশন যোগ্যতার পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে খসড়া নীতিমালায় কিছু বলা হয়নি।

ইউজিসির আলোচ্য শিক্ষক নিয়োগের খসড়া নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অনেক দেরি হতে পারে। কারণ, এ নীতিমালার বাস্তবায়ন কবে থেকে শুরু হবে সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা যায়নি এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করে দ্রুততার সঙ্গে খসড়া নীতিমালার ওপর মতামত পাঠাতে বলা হয়নি। এর ফলে ভিসিদের হাতে পুরনো ব্যবস্থায় গড়িমসি করে দলীয় প্রার্থীদের নিয়োগের সুযোগ থেকে যাবে। ইউজিসি যদি সত্যিই প্রভাষক নিয়োগে মেধাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এ ক্ষেত্রে শৃংখলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাহলে উচিত হবে যত দ্রুত সম্ভব এ নীতিমালা চূড়ান্ত করা। সেইসঙ্গে মৌখিক পরীক্ষার সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ও প্রেজেন্টেশনের ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করা। শিক্ষক নিয়োগে দলীয় প্রভাব কমাতে লিখিত পরীক্ষার খাতার মতো প্রার্থীর প্রেজেন্টেশনের ভিডিও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে কোনো প্রার্থী লিখিত পরীক্ষা ও প্রেজেন্টেশনে তাকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি মনে করলে ওই প্রার্থীকে তার লিখিত পরীক্ষার খাতা ও প্রেজেন্টেশনের সিডি পুনঃমূল্যায়নের জন্য চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ প্রদান করা। এ বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ করলেই যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রাতারাতি মানসম্পন্ন শিক্ষক তৈরি হবে এমন নয়। আলোচ্য অভিন্ন শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা পেশাদারিত্বের সঙ্গে অনেক বছর ধরে অনুসৃত হলে এ ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে উন্নতি হতে পারে। কারণ, গত এক দশকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাশিত যোগ্যতা ছাড়াই অযাচিতভাবে অনেকে শিক্ষক হিসেবে চাকরিতে ঢুকে পড়েছেন। তাদের পারফরম্যান্স ভালো না হলে সার্বিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসম্পন্ন শিক্ষক তৈরি হবে না এটাই স্বাভাবিক। একটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচিত হয় তার শিক্ষকদের পারফরম্যান্স দিয়ে। শিক্ষকদের অবদানমূলক একাডেমিক পারফরম্যান্সেই কোনো বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি পায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সূচকে নিজের অবস্থান উপরে তুলে নিতে পারে। বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষক নিয়োগে পেশাদারিত্ব ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে না পারায় এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। সুশাসনের অভাব এবং দলীয় রাজনীতির প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় নিজ ডিসিপ্লিনে অবদান সৃষ্টিকারী খ্যাতিমান শিক্ষকের সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে কমে যাচ্ছে। জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে অচিরেই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় মানসম্পন্ন শিক্ষকের দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় দেরিতে হলেও ইউজিসি এ ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিয়েছে। দেখার বিষয়, ইউজিসি শিক্ষক নিয়োগে প্রস্তাবিত অভিন্ন নীতিমালা তৈরি ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তভাবে তা বাস্তবায়ন করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুশাসনের সূচনা ঘটাতে পারে কিনা। এ কাজে ব্যর্থ হলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান আরও ধসে পড়বে। উচ্চশিক্ষাঙ্গনে সৃষ্টি হবে মানসম্পন্ন শিক্ষকের দীর্ঘমেয়াদি দুর্ভিক্ষ।

ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার : *অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়*
akhtermy@gmail.com